ছোপ ছোপ কাটাকুটি

তৃপ্তি সাস্ত্রা

পুনশ্চ

সূচিপত্র

১।	হ্যান্ডসাম্ মেয়েরা	১১
২।	'মেঠো—বোহেমিয়ান' কুঞ্জলাল	১৩
৩।	তরাই-গন্ডার	১৫
৪।	জয়-রাধে	১৭
৫।	ছোটো তামাসা, বড়ো তামাসা	১৯
৬।	বাপ ব্যাটা দু-ভাই মিলে	২২
৭।	উজানি মেয়ে	২৬
৮।	শ্রাবণ-কথা	২৯
৯।	অ্যাঞ্জেলিন খারমালকি	৩২
১০।	মাতৃপক্ষ	৩৫
১১।	কালো মেয়ের উৎসব	৩৭
১২।	হেমন্তের এপিটাফ	৪০
১৩।	বর্ষীয়সী রূপসীরা	৪৪
১৪।	ধীর লয়ের গান	৪৮
১৫।	আমার একুশ	৫০
১৬।	পরিযায়ী	৫৩
১৭।	জিভ দেখাও	৫৬
১৮।	লেখো আয়ু লেখো	৫৯
১৯।	মেলায় যাইরে	৬২
২০।	হুদুম দেও : যে নাচের কোনও দর্শক নেই	৬৬
২১।	শতবর্ষে ইসমত চুগতাই	৬৯
২২।	ঘুড়ির ছয়লাপ—আকাশে ইচ্ছে ডানা	৭৩
২৩।	ক অক্ষর	৭৬
২৪।	ধ্রুপদী	৮০
২৫।	নূর মিয়াঁর সুর্মা	৮৪
২৬।	I has	৮৭
২৭।	সুখময়ী	৯০

২৮। ভাত বেড়ে রেখো, ফিরে এসে খাবো... ৯৩
২৯। সুকন্যা গৌড়ে যায়... ৯৭
৩০। পাখির চোখ ১০১
৩১। 'অরণ্যের অধিকার' ১০৪
৩২। অমৃতলোকের সমীরণদা ১০৮
৩৩। পিসিমা ১১২
৩৪। নার্সিশাস ১১৫
৩৫। জয় বাবা ফেলুনাথ ১১৮
৩৬। টয়লেট আর আগার পাগার ১২২
৩৭। মায়া বন ১২৬
৩৮। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংস ১৩০
৩৯। অক্ষর-আশ্রম ১৩৫
৪০। বাংলা ভাষার নতুন পড়ার ঘর ১৩৯
৪১। বিবির পুকুর ১৪৪
৪২। মায়ের ভাংচি ১৪৭
৪৩। যে আমাকে বাসযোগ্য প্রমাণ করেছে ১৫১
৪৪। বড়ো নদী ১৫৫
৪৫। চকবন্দী ভূগোল ১৫৮
৪৬। কেমন হবে... আমার শহর ১৬৩
৪৭। মা গে ১৬৮

দারুণভাবে আকর্ষণীয়া মেয়েদের ক্ষেত্রে 'হ্যান্ডসাম উওম্যান' ব্যবহার করা যেতে পারে। ভেনাস আর সেরেনা উইলিয়াম্স যেমন হ্যান্ডসাম্ উওমেন...

'হটেনটট ভেনাস' থেকে 'হ্যান্ডসাম ভেনাস, সেরেনা'—নিজের প্রয়োজনেই বুঝি কর্পোরেট দুনিয়া পালটে নিল ডিকশন্। আফ্রিকার মানুষ এমনকি মেয়েদের শরীরও কত আলাদা, কেমন পশুর মতো—এটা প্রমাণ করার জন্য আফ্রিকা থেকে 'সংগ্রহ' করা হয়েছিল, 'হটেনটট ভেনাস' কে—উলঙ্গ করে তাঁকে প্রদর্শিত করা হয়েছিল লন্ডন, ফ্রান্স সহ বড় বড় শহরে। ব্রিটিশ সূর্য অস্ত যেত না—তখনকার কথা।

পৃথিবী পাল্টাচ্ছে। হ্যান্ডসাম্ মেয়েদের কথা পড়ে আমার প্রথমেই টুলুর কথা মনে পড়ল। চওড়া গড়নের স্বাস্থ্যবতী, সদা হাস্যময়ী টুলু। চমৎকার গান গায়। হাতের লেখা মুক্তোর মতো। ছবি আঁকে। জোরে দৌড়ায়। আর পাড়ার মোড়টা পেরোতে একটু সিঁটকে যায়। টুলু ঘন মেঘবর্ণা কালো। দাঁত সামান্য উঁচু। দাঁত বেরোয় না কিন্তু মুখের ওই জায়গাটা একটু বেশি কালো। মোড় পেরোবার সময় আওয়াজ আসে—'ওই যে কালাহাঁড়ি আসছে'...

তো ইশকুলে এমন গানের রিহার্সাল হচ্ছে, নতুন নতুন গান শোনা আর শেখার আনন্দে টুলু ভুলে যাচ্ছে, রাস্তাঘাটের এইসব অপমান। মাস্তুদি কী চমৎকার গায়—'ফুল বলে ধন্য আমি/ধন্য আমি মাটির পরে'—আর টুলু শুনে শুনেই কী অনায়াসে সে গান তুলে নিতে পারে—আমাদের তাক্ লেগে যায়।

কীভাবে পারিস্ টুলু?

কী পারি?

শুনে শুনে যে এমন গান তুলে ফেলিস্।

বাঃ। গানটাতো জমিয়ে রাখি। আর তারপর দিনরাত খরচ করি।

কোথায় জমাস্?

কেন বুকে!

নীল টিউনিকের নিচে ওই উদ্ধত বুকে শুধু গান? মধ্যবিত্ত মফঃস্বলের আটদশ ভাইবোনের ঘরে নড়বড়ে তক্তপোষে শুয়ে রোজ রাতে একা সেই মেঘবর্ণা কিন্নরী সুরের মান্দাসে ভেসে পাড়ি দেয় সুরের গন্ধর্ব-লোকে—নেহাৎ উন্মাদ ছাড়া এই গাল গপ্পো আর স্বপ্ন বিশ্বাস করবে কে!

ইশকুলের স্টেজ থেকে পাড়ার স্টেজে পৌঁছাবার জন্য এতো সব স্বপ্নের দরকার হয় না। স্বপ্ন দেখলেও সেটা প্রকাশ না করাই সুস্থতার লক্ষণ। টুলু শুধু

পাড়া নয় শহরের সব জলসাতেই জায়গা করে নেয়। ক্লাসিকাল টাচের হিন্দি গান করে স্টেজ মাতায়। কিন্তু পড়াশোনায় যথেষ্ট ভালো হওয়া সত্ত্বেও কেন জানি বি এ টা পাশ করতে পারে না। হিস্ট্রিতে তিনবারই ব্যাক—তিনবারই নম্বর দশ-এর নিচে। নক্ষত্রদুষ্ট হয়ে পড়ে টুলু। নেশা ধরে। মধ্যবিত্ত মেয়ের সফেদ পানদোক্তা নেশা। নানারকম ব্যস্ততায় আমাদের যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। একদিন কলেজের মাঠে দেখা। শরীর ভেঙে গেছে। গান করছিসতো—এই কথার উত্তরে, কী অদ্ভুত গলায় বলতে থাকে—ওরা কত ভালো ভালো খায় বল। ফল, দুধ, ডিম, ওষুধ ... তবে না ধরে রাখা যায়! আর বড় জায়গায় না থাকলে সুযোগ কোথায়। একটা কাশি হচ্ছে আর এতো রক্ত কম!

ওরা মানে কার কথা বলছিস্?

কেন লতা, আশা সবার কথা-ই। কত বছর ধরে টানা কী রকম গাইছে বল।

টুলুকে সবাই লতাকণ্ঠী বলতো বটে। আমি ভয়ে ভয়ে বলি-গান গাইছিস্ তো টুলু...

—কোথায়? কী কাশি, আর দম থাকে না।

খুব পান খাস না। দোক্তাও?

দিদি বাবা খেতে দেয় না জানিস্।

বলতে বলতে গলা ভারী হয়ে আসে, ছলছল করে চোখ। লক্ষ্য করি চুল বয়কাট করে ফেলেছে টুলু। আর কেমন রোগাটে কিশোর দেখাচ্ছে ওকে। এমন মেয়েরা এইরকম ছাঁদে চুল কেটে জিনস্ বা শর্টস পরে গিটার নিয়ে স্টেজে উদ্দাম গায়, নাচে।

চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্র, চওড়া পেশীবহুল শরীরের ছন্দ যেন বুনো বাইসন—সবুজ কোর্টে রণজয়ের শীৎকার নিয়ে ওই যে ভেনাস সেরেণা—আমার প্রিয় উইলিয়াম বোনের হাতে ঝকঝক করে ওঠে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি। আর ওই যে আসমানী নীল শাড়ি গায়ে কালো কালো ঘন কালো মেঘবর্ণা টুলু মাতাল সুরের শাম্পানে ভাসিয়ে দিচ্ছে আমাদের পাড়ার মোড়, ছোটো রাস্তা, হাইওয়ে এমন কী রাজধানী-হৃদয়। কী মহার্ঘ্য আকর্ষণীয়া আশ্চর্যময়ী দেখাচ্ছে টুলুকে। মনে পড়ছে ওর ভালো নাম ছিল দীপ্তি। দীপ্তি রায়। চাঁদপানা মুখের কাঞ্চনবর্ণা শ্রীময়ী Pretty girl না হবার দুঃখে গুটিয়ে যাওয়া নয়। আপন কীর্তিতে নির্ণীত হচ্ছে স্থানাঙ্ক। উজ্জ্বল Handsome হয়ে উঠছে টুলু, দীপ্তিরা। হেমন্ত কুয়াশায় নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে টুপটাপ ঝরে পড়ছে না...।

॥ 'মেঠো—বোহেমিয়ান' কুঞ্জলাল ॥

কুঞ্জলালের কথা বলি। কলোনির সাজানো বাবুদের বাইরে আমার দেখা প্রথম মেঠো—বোহেমিয়ান।

আটের দশকের শুরু। সব ফাঁকা জায়গা ভরে যাচ্ছে। গজাচ্ছে কংক্রিটের কাঠামো বাঁশের মাচান। খাঁড়া বাঁশের মাথায় কাকতাড়ুয়া। জমি থেকে কাকতাড়ুয়ারা সরে আসছে শহরে। মানুষের ঈর্ষায় কংক্রিটেও ফাটল ধরে নিশ্চয়ই, তা নইলে আর কাকতাড়ুয়া কেন।

প্রবাদপ্রতীম অধ্যক্ষ দুর্গাকিংকর ভট্টাচার্য অবসরের পর কোয়ার্টার ছেড়ে চলে গেছেন। পরিত্যক্ত আবাসনটি পুরুষ-সিংহের প্রতীক্ষায়। মাঠে লাগানো আলু, কপি, সব্জি, ক্ষেতের দেখাশোনা করত কুঞ্জলাল। কলেজ থেকে অনেক দিন ধরেই সবাই চেষ্টা করেছে ওকে মাইনে দিয়ে মালী বা কেয়ারটেকার করে রাখার। ও ব্যাটা শাকসবজি, রস বেচবে; বাবুদের বাড়িতে পাট খাটবে, আধপেটা খেয়ে থাকবে তবু এমন দেমাক চাকরি করবে না। বক্তব্য পরিষ্কার —'এই তো দালান ঘরে আছি, শাকসবজি বেচছি খেছি। ও গুলান অফিসের ইয়াতে আমার কাম নাই। নোকর হই না।'

নোকর হওয়ার জন্য যাদের জীবন বলিপ্রদত্ত তারা এইসব কথা শুনে ক্ষেপে যায় খুব। আর ছকের বাইরের এই মানুষটিকে খুব অবাক চোখে দেখে। খেটে খাওয়া শক্ত শরীর—অম্বল, সুগার, প্রেশার কী জানে না। খাটো ধুতি, কাঁধে নীল ডোরা কাটা গামছা, কানে লাল সুতো বাঁধা বিড়ি—হাতে চকচকে কাস্তে বা দা। আর মাথায় ঘাসের আঁটি নিয়ে বাবুদের তালিমারা যৌবনকে লাথি মেরে রাজার মতো চোরকাঁটা ভরা মাঠ পেরোয় কুঞ্জলাল।

কলেজ পুকুরের দক্ষিণ পাড়ের বড় গাছটা শুকিয়ে মরে গেল চোখের সামনে। গরমের দুপুরে প্রেম করার গাছ। নেশা করার গাছ। কিন্তু কী গাছ? কেউ নাম জানে না। গাছের দুঃখে কেউ কেউ কবিতাও লিখে ফেলল। সেই কবিতা কুঞ্জলাল বুঝবে না। কিন্তু গাছটা অবশ্যই জানবে। গাছের খবর নিতেই কুঞ্জলাল বলে—'কিনতা কি! কিন্তু ওটা যে বেচা হয়ে গেল। শস্তায় বিকালো—মাত্র নশো টাকায়। গাছের কথা শুধ্যাও ক্যানে?'

'ভারী চমৎকার গাছ। কত আড্ডা মেরেছি
ওখানে। খুব খারাপ লাগছে।'
—'শিরীষ গাছ অমনই হয়। খুব রমরমা
গাছ, ছায়াও ছিল খুব। তা কাঠও তো মেলা হবে।'

এইসব দার্শনিকতায় বিরক্ত হয়েছে সবাই। বউ মারা যাওয়ার সময়ও এইরকম ডায়ালগ দিয়েছে কুঞ্জলাল। সুন্দরী বউ। মুলুকে তার মতো গতর নাকি কারো ছিল না। তো সেই ডব্‌কা বউ রোগে ভোগে অথর্ব হয়ে মারা গেল। সবাই কালো মুখ করে সমবেদনা জানাতে গেল—'কবে মরে গেল রে?'

'অত্তো মনে নাই। তবে জোয়ান বউ, ছয় ছেলের মা'

'কাঁদলি খুব?'

'না। ওর মরাই ভালো ছিল।'

'কেন?'

'বীমারীতে বিছানা নিল যে। উঠতে পারল না ছয় মাস তক্ উ ব্যাঁচে থেকে কী হত বল?'

অকাট যুক্তি। কল্পনাবিলাসী ছেলে ছোকরা কুঞ্জলালের নতুন সংসার পাতার গল্প শোনার অপেক্ষায় রইল।

গাছ থেকে পড়ে ঠ্যাং ভাঙল কুঞ্জলাল। খেজুরগাছের মাথা থেকে পড়ে ওপারে চলে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। পাড়ার ছেলেরাই হাসপাতালে নিয়ে গেল। কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার। কিন্তু হাসপাতালে থাকল না। জোর করে কলেজ কোয়ার্টারে চলে এলো। কে দেখবে? কেন ভাই বংশী। তো বংশী এসেছিল। কুঞ্জলালের পায়ে বাঁধা ব্যান্ডেজ। ছেড়া কাঁথা। ধুদ্দুরে পরণের কাপড়। পাশে উদোম গায়ে বসে থাকা ভাই। প্যাটের ব্যামো হলো কী কী দাওয়াই লাগে, মনিহারী মেলায় নৌটঙ্কি, ত্যালতেলা গায়ের মহিষের গলায় সবুজ পুঁতির মালা, নানীর হাতে ঝিটকিনি ফুলের বড়া ... এই সব গল্প সেরে মাস দুই পর ভাই চলে গেল। কুঞ্জলাল তখনও সোজা হয়ে খাড়াতে পারেনি। আরও দুটো মাস কোনোরকমে চালিয়ে নিল কুঞ্জলাল। তারপর একদিন দেখা গেল হাতের পাকা বাঁশের লাঠিখানা উঁচু করে কুলগাছ ঝাঁকাচ্ছে। বেশ রঙ ধরা কুল। গুচ্ছেক ওর মুখে। গুচ্ছেক নিচে। ছেলেমানুষী হেসে জানাল ঝালনুন দিয়ে বেশ লাগে বুঝলা?

সে তো বুঝলাম। কিন্তু ভাই চলে যাওয়ার পর একা একা এখানে বসে কি করতে?

—ক্যানে, তেলকুচা লতের দুলুনি দেখতাম।

—তাতে কি!

—ইঃ। কচি মেয়ের ঠোঁট' যেন

বড় বড় চৌকো হলদে দাঁত বের করে হাসতে লাগল কুঞ্জলাল। সামনে জাদুমাঠ। জাদুমাঠে তেলকুচা লতা। তেলকুচা লতার দুলুনিতে কিশোরীর ঠোঁট...

॥ তরাই-গন্ডার ॥

হলুদ মাঘ আর লাল ফাগুন জড়ানো ফেব্রুয়ারি রোদ আর বৃষ্টি নিয়ে কাটাকুটি খেলছে। রোদ আগে রাখি না বৃষ্টি। শ্রীপঞ্চমী, মাঘী পূর্ণিমা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস—যখন ভাবছি এসবের কথা লিখব, অনুপস্থিত কাউকে যেন টের পাচ্ছি। বরিন্দ আর দিয়ারায় পা গেঁথে অন্ধকারে কেউ যেন দাঁড়িয়ে। বুকে তরাই জঙ্গল। রাত্রি গভীর। পাতায় বৃষ্টির শব্দ। যেন অঝোর কবিতা। কেউ কবিতা পড়ছেন। স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে অগ্রন্থিত কাব্যগ্রন্থের অক্ষরমালা পড়ছেন। 'কী যেন তরাইগন্ডার তার এক নাম।

গৃহ নক্সাল' ... এমনই তো লিখেছিলেন। বানিয়ে লেখেননি। এই তাঁর অভিজ্ঞান। তাঁর যাপন চিত্র। থই থই করে জীবন ও জীবিকা। সংসার ও গেরস্থালি। জায়া ও সন্ততি। পিছল পথে পা হড়কে পড়ে যায় জীবন, ভিজে যায় কবিতার খাতা, দু-চারটে শব্দ শুধু রয়ে যায়। লেখা যত না লেখা ঢের। শুধু অঝোর বৃষ্টির সামগান। শ্রুতি। শুধু মুখে মুখে উচ্চারণ। উচ্চারিত হচ্ছে বীজমন্ত্র, 'অ-ভালবাসা, অ-স্নেহ, অ-দরদ, অ-মায়া, অ-সংগ্রাম'...

ভিড়ের হৃদয় থেকে দূরে-নিজের মুদ্রাদোষে একাকী সমাজ বদলের খোয়াবনামা হারিয়ে 'কবিতা অসুখে' ছটফট এই যুবককে আমরা সবাই সাত আটের দশক থেকে চিনি। তিনি টল, ডার্ক, হ্যান্ডসাম। ঠোঁটটি নিখুঁত দ্বিতীয় বন্ধনী। ঠোঁটটি আগুন। 'হেই ভারতবর্ষ আছেন নাকী'—দৃপ্ত দৃঢ় উচ্চারণ এখনও কানে লেগে থাকে।

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'মুক্তমেঘ'। তথ্য প্রযুক্তির বিস্ফোরণ অনেক পরে কিন্তু সেই তখন থেকে তিনি স্বপ্ন দেখতেন 'মুক্তমেঘ' ছড়িয়ে পড়ছে সারা বাংলায়। শব্দের জাদু-চাদরে জড়িয়ে নিতে চেয়েছিলেন অসংখ্য মানুষকে। শব্দের ছেনালীতে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে কখন যেন সেই টগবগে প্রাণশক্তি আধারহীন। তরল গড়িয়ে গেলে গভীর হেমলকে ডুবে কবি যেন বিষপাতা, বিষখাতা কোনও। টালমাটাল যাপন। দেওয়ালে দেওয়াল। রাস্তায় রাস্তা...

জীবন ও কবিতাকে এক করে দেবার দুঃসাহসে উপেক্ষা, অপমানের জবাবে প্রবল গোঁ, বিষ, ক্রোধ জমে জমে দৃঢ় হয় 'তরাইগন্ডার' এর খড়্গাখানি। ফালাফালা করে দিতে চায় প্রতিষ্ঠানিক স্থবিরতা। 'তরাইগণ্ডার'—পত্রিকা ও সম্পাদক একমিথ।